:: ৯৮তম অন্তর্জাল সংখ্যা ::

৭ই আশ্বিন, ৯৪২৮ / 24.09.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
মৃত্যুর পর কি হয়?	শ্রীঅরবিন্দ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রী অনিলবরণ রায়
আনন্দময়ী মায়ের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
আজকের বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ	ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ
কবিতা ঘরে	শ্রী দীপঙ্কর নন্দী
এখন গান্ধারদেশ	শ্রী প্রকাশ অধিকারী
অহংকার	স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ
শারদ – আহ্বান	সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

প্রীতি-কণা

"দেহ নয় – আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ হলেই তুমি অন্যের দুঃখ ও ব্যথা বুঝতে সক্ষম হবে।"

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

পার্থসারথিতে ভাদ্রমাসের (সন ১৩৯৫) লেখা আমার সময়মত হয়নি। আমি কিছুতেই পেরে উঠছি না। আমার লেখা প্রথম দিকে আর ঠাঁই পায় নি – এখন আমি সবার পিছনে এগোচ্ছি। এই লেখার দেরী হবার কারণ আর কিছু নয়, আমার স্বামীর জীবে সেবা ও বিশ্বপ্রেমের theory. তিনি যে এত ভালবাসার লোক রেখে গেছিলেন তা আমারও জানা ছিল না। জানা থাকলে তাঁকে বলতাম, "ওগো! তোমার এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার দরকার নেই, আমি না হয় রোজ আরও ৪৫-৫০ কাপ চা বেশী করে দেব।" কোন কোন "নিজের জন" আছেন, যাঁরা কি মনে করে একমাস দেড়মাস পর হঠাৎই এক সকাল দুপুর বা সন্ধ্যায় হাজির হন, সেই একদিনেই তার অনুপস্থিতির কালে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলী জেনে যেতে চান পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে। এখন আমার সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে গেছে। আজ শ্রীপ্রীতিকুমার আমার সামনে থাকলে আমি অনেক স্পষ্ট কথা বলে ফেলতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি কিছু বলি না। ১৯৫৭ সাল থেকে নিজের ভরণপোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। জীবনে সারবস্তু বুঝে গেছি নিজের পায়ে জোর না থাকলে কেউ চলতে সাহায্য করে না – নিজের কাছে অর্থ না থাকলে কেউ সারাজীবন টানতে পারে না। আবার আমি ভালভাবে থাকতে চাইলেও অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে – কি ভাবে চালাচ্ছি, কোথা থেকে আসছে, লটারীর টাকা পেয়ে গেলাম কিনা ...। এখন আর আমাদের সমস্যা নিয়ে কেউ মাথা না ঘামালে আমরা বিচলিত হই না। শ্রীপ্রীতিকুমারের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আমিও মানসিক ভাবে আরও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছি। আমি একা একা পথ চলতে আর ভয় পাই না। আমি জানি কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা রক্ষা পাবই। সুতরাং শত্রুরা সাবধান – আর এগিয়ে লাভ নেই। পৌনে দু বছর পার করে দিলাম শ্রীপ্রীতিকুমার যাবার পর। কোথাও পথ দুর্গম হয় নি। মার যা খেয়েছি, তা নীচ শ্রেণীর লোকদের estimate করতে না পারবার জন্য। সেটা আমার অসহায়তা নয়, সেটা আমার ক্ষুদ্রতাবোধের অভাব।

শ্রীপ্রীতিকুমারের কথায় আসি এবার। বেশী কথা বলতেন না, কিন্তু যেটুকু বলতেন অত্যন্ত ধীরে এবং স্পষ্টভাবে। আমার সাথে বিয়ের আগে আমার আচার আচরণগুলি তিনি খুব ভাল করে লক্ষ্য করতেন। শাকসব্জি খাওয়া আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না। তাঁর মা অনেকরকম তরকারি

রান্না করতেন এবং যাকে পরিবেশন করতেন সবরকম রান্না করা বিষয়বস্তু তাকে গ্রহণ করতে হত। মা-ও ছিলেন মিতভাষিণী, কিন্তু তাঁর পরিবেশন করা বস্তুটি না খেতে চাইলে কষ্ট পেতেন বোঝা যেত। আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে ছিলাম শিশুর মতো। আমার বায়না ছিল কালো রঙের রান্না আমি খাব না। শুক্তো ডুমুর কচুশাক ইত্যাদি তাঁদের compulsory item ছিল। আশীর্বাদ হয়ে যাবার বহুদিন পর আমার বিয়ে হয়েছিল। একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন, আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন। একথা সেকথার পর তিনি বললেন, "আমার মা যদি তোমাকে কোনও তরকারি খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তাহলেত' তোমার খুব কষ্ট হবে। তোমার তো পছন্দ হবে না। অশান্তি হবে।" হঠাৎ দেখি তাঁর চোখে জল। আমার মতো Spirited lady কি আর দেরী করি? তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, "না, না, আমার জন্য ভাবতে হবে না, আমি সব খেয়ে নেব।" এখন বলতে ভাল লাগছে পরবর্তী জীবনে মায়ের সেই রান্না খাবার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম।

আমার কোনরকম সুবিধা অসুবিধার প্রতি তাঁর খুব সজাগ দৃষ্টি ছিল। আমি কষ্ট পাব তিনি ভাবতে পারতেন না। কিন্তু পরবর্তী জীবনে দেখেছিলাম জনগনের স্রোতে তিনি যখন মিশে গেছিলেন তখনও হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন, "শুনছো?... শুনছো?" ... দৌড়ে এলাম ... একটু হাসলেন, মিষ্টি করে বললেন, "তোমাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়!" প্রচণ্ড কাজের সময় খুব রেগে যেতাম। আমি এখনও বুঝতে পারিনা সত্যি কথা বলতেন, না কোনও লোক সামনে থাকলে তাঁর প্রেমভাবের প্রকাশ ঘটাতেন! আমার এখন খালি বাড়িতে বসে মনে হয় কেন বুঝতে পারলাম না এমন একটি লোকের সঙ্গ পেয়েছিলাম! কেন জিজ্ঞাসা করিনি পরবর্তী জীবনে আমি কি করব? কেন বুঝতে চাই নি তিনি কে ... কেন এসেছেন ... কি তাঁর করণীয় ছিল? এখনও অনেকে দেখি তাঁর শয্যাটা স্পর্শ করেও শিহরণ বোধ করে। তাঁর ঘরে ঢুকে চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে ... কাঁদে ... আমার কষ্ট হয় আমি কেন বুঝতে চাইলাম না, আমি কেন তাঁর কাছ থেকে কিছু চাইলাম না, সে চাওয়া যা আমাকে সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি এনে দেবে, যার জন্য এত লোক এত পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। তবু আমার একটা ধারণা আছে সময়মতো আমি ঠিক কোনো নির্দেশ পাবো। তাই অপেক্ষা করে আছি কবে আমার সে সময় আসে। **

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (** রচনা কালঃ আগস্ট, ১৯৮৮)

মৃত্যুর প্রয়োজন –

দেহগত জীব একই দেহে থেকে উন্নতি লাভ করার যোগ্যতা এখনও অর্জন করে নাই এবং দেহ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নয়, তাই দেহ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, এই জন্যই মৃত্যুর অস্তিত্ব।

স্বেচ্ছামৃত্যু – নিজের সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কোন কারণে মৃত্যু হবে না, এরূপ অবস্থা লাভ হতে পারে চেতনার পরিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলে, আর সেই চেতনার পরিবর্তন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মধ্যে সংঘটিত করতে হবে।

বিশুদ্ধ আত্মা অজ, জন্ম বা মৃত্যুবিহীন, দেহ মন প্রাণ বর্জিত; এই সৃষ্ট প্রকৃতি থেকে পৃথক।

জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়ে গমন করে, যদিও জীবাত্মা (soul) মরে না, কারণ জীবাত্মা অমর – এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় মর্ত্যলোক থেকে অন্য লোকে গমন করে এবং পুনরায় পার্থিব জীবনে ফিরে আসে।

এই জন্ম জীবন মরণের ফলে জীবাত্মা নিজস্ব সত্তায় গড়ে উঠে, তাকে আমরা বলি চৈত্য পুরুষ, এই চৈত্য পুরুষই ক্রমবিকাশের ভিত্তি, এবং শারীর, প্রাণজ চেতনার সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে জাগতিক অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু এমন একটি সময় আসে যখন এই চৈত্যপুরুষ আবরণের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসার যোগ্যতা লাভ করে; এবং নিজ নেতৃত্ব গ্রহণ করে সমগ্র কারণরূপী প্রকৃতিকে দিব্য পরিপূর্ণতার অভিমুখী করে। এখানেই অধ্যাত্ম জীবনের সূত্রপাত। জীবাত্মা (soul) এখন মানস স্তর অপেক্ষা উর্ধ্বতর বিকাশের জন্য প্রস্তুত হতে পারে, মানস স্তর অতিক্রম করে অধ্যাত্ম স্তরে যেতে পারে এবং অধ্যাত্ম স্তরের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে অতিমানস অবস্থায় গমন করতে পারে। এই অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত জন্মের নিবৃত্তি হয় না। আধ্যাত্মিক অত্যুন্নত অবস্থা লাভান্তে পার্থিব সৃষ্টি থেকে যদি সে সরে পড়তে চায় তবে সে সত্যই তা করতে পারে – কিন্তু এর চেয়ে উচ্চতর বিকাশও আছে, তা অজ্ঞানের সীমার পরপারে জ্ঞানের ভূমিকায়। চৈত্যপুরুষ পুনর্জন্ম লাভের সময় আসা পর্যন্ত চৈত্যলোকে বিশ্রামের জন্য গমন করে। জীবাত্মা (soul) চেতনাশূন্য হতে পারে না, কারণ চেতনাই তার প্রকৃতি,

তথাকথিত নিশ্চেতনা দ্বারা কেবল আবৃত হতে পারে, নষ্ট হয় না, লোপ পায় না।

চৈত্যপুরুষ জীবনের অভিজ্ঞতা সমূহ, নিয়মিত ভাবে পরের জীবনে নিয়ে যায় না। সে নূতন মন, প্রাণ ও দেহ গ্রহণ করে। অতীত অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মসার চৈত্যপুরুষে সঞ্চিত থাকে।

মৃত্যুকালে পুরুষ দেহ থেকে বহির্গত হয় সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে এবং বিভিন্ন লোকে গমন করে এবং পার্থিব জীবনের ফলস্বরূপ কতিপয় অভিজ্ঞতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে। পরে সে চৈত্যলোকে উপনীত হয়, সেখানে সে একপ্রকার নিদ্রা অবলম্বন করে, বিশ্রাম করে, এই বিশ্রাম চলে নবীন জীবন লাভের জন্য পৃথিবীতে যাওয়ার সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু এমন সব উচ্চতর অবস্থার জীব আছে যারা এ নিয়ম অনুসরণ করে না।

দেহ ত্যাগ করে জীবাত্মা (soul) অন্যান্য লোকে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পরে মনোময় প্রাণময় কোষ বিসর্জন করে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার সারাংশ আত্মস্থ করার জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং নবজীবনের জন্যে প্রস্তুতি করে।

বিদেহী জীবাত্মা বিগত অভিজ্ঞতার সারাংশ মাত্র রক্ষণ করে, বিস্তৃত বিবরণ নহে।

যদি বর্তমান জন্মে মনোময় প্রাণময় কোষ সঙ্গে নিয়ে আসে তাহলেই অতীত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ স্মরণ করার সম্ভাবনা থাকে। অন্যথা কেবল যোগ দৃষ্টি সহায়েই পূর্বস্মৃতি আসে।

মৃত্যুর পর কিছুকাল জীব প্রাণময় জগৎ অতিক্রম করার কালে কিছু সময় তথায় বাস করে।

এই যে স্থান পরিবর্তন, এর প্রথমাংশই বিপদসঙ্কুল অথবা দুঃখময় হতে পারে। বাকী সময়টা জীব অবস্থাবিশেষের মধ্যে থেকে তার দেহে জীবিত অবস্থায় থাকাকালীন বাসনা ও সংস্কারের অবশিষ্টাংশ ভোগ করে। ভোগ করে যখন সে শ্রান্ত হয় এবং অগ্রগতির যোগ্যতা লাভ করে, তখন প্রাণময় কোষ খসে পড়ে এবং জীবাত্মা মনোময় কোষের অবশিষ্টাংশ হতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ান্তে চৈত্যলোকে গিয়ে এক প্রকার বিশ্রামের অবস্থায় প্রবেশ করে এবং পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভের পূর্ব পর্যন্ত উক্তাবস্থায় অবস্থান করে।

বিদেহী আত্মাকে সহায়তা করা যায় তার হিত চিন্তা দ্বারা এবং গুহ্যবিদ্যার জ্ঞান থাকলে তদ্বারা। বিদেহী আত্মাদের জন্য শোক করে বা তাদের জন্য লালসা পোষণ করে, অথবা অন্য কিছু দ্বারা তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া উচিত নয়, ঐরূপ ব্যবহারে তাদিকে পৃথিবীর সন্নিকটে টেনে আনা হবে অথবা তাদের বিশ্রাম স্থানে যাত্রায় বিলম্ব ঘটানো হবে।

চৈত্যলোকে গমনের পথে চৈত্যপুরুষের বাহ্যকোষগুলি বিসর্জন করা হল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু বহু প্রকার ব্যতিক্রম হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জন্মগ্রহণের দৃষ্টান্ত আছে। কখন কখন অতীত জীবনের ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ স্মৃতি বর্তমান থাকে।

স্বর্গ ও নরক সচরাচর জীবের কাল্পনিক অবস্থা, অথবা বরং বলা চলে প্রাণময় পুরুষ দেহ হতে প্রয়াণের পরে কল্পনার সহায়ে স্বর্গ নরক সৃষ্টি করে। নরক অর্থ প্রাণলোক অতিক্রম করার সময় ক্লেশ প্রাপ্ত হওয়া, অথবা দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বহু ক্ষেত্রে যারা আত্মহত্যা করে তারা এই অস্বাভাবিক ও অত্যুগ্রভাবে দেহ থেকে প্রস্থানের ফলে যে ক্লেশ এবং বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

অবশ্যই দুঃখপূর্ণ বা আনন্দপূরণ প্রাণলোক ও মনোময় লোক বর্তমান আছে, নিজ নিজ প্রকৃতিগত আকর্ষণের ফলে জীবকূল যে সব লোক অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের শাস্তিরূপ কল্পনা অমার্জিত রুচি ও গ্রাম্য ধারণার পরিচায়ক, সাধারণ লোকদিগের ভ্রমাত্মক কল্পনা।

মানবাত্মা (soul) পুনর্জন্মগ্রহণ করলে সবই বিস্মৃত হবে এমন কোন নিয়ম নাই। পুনর্জীবনের সুদৃঢ় এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাহার যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে বাধা প্রদান করে। এমন লোক আছে যাদের পূর্বজন্মের কথা সুস্পষ্ট মনে আছে। চৈত্যপুরুষ যা সাথে নিয়ে যায় এবং সাথে নিয়ে আসে তা সাধারণত অভিজ্ঞতার সার মাত্র, বিশেষ বিবরণ নহে।

মানবাত্মা সোজাসুজি চৈত্যলোকে যেতে পারে কিন্তু তা নির্ভর করে প্রয়াণ কালের চেতনার অবস্থার উপর। চৈত্যপুরুষ যদি তখন সম্মুখে থাকে (জাগ্রত থাকে) তাহলে অব্যবহিত সংক্রমণ সম্পূর্ণ সম্ভব। ইহা প্রাণ, মন চৈত্যপুরুষের অমরত্ব লাভের অপেক্ষা রাখে না। যারা ঐরূপ অমরত্ব লাভ করেছেন তাদের বরং বিভিন্ন লোকে বিচরণ এবং এমন কি বদ্ধ না হয়ে স্থূল পার্থিব জগতের উপর ক্রিয়া করার সামর্থ্য থাকে। বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই। চৈত্যপুরুষ মন, প্রাণ ও দেহের পশ্চাতে থেকে তাদিকে ধারণ করে;

সেইরূপ চৈত্যলোকও মনোময়, প্রাণময় ও পার্থিব জগতের পর্যায়ের একটি জগত নহে, কিন্তু এসব লোকের পশ্চাতে অবস্থিত এবং এই জগতে ক্রমবিকাশমান মানবাত্মা একটি জীবন ও পরবর্তী জীবনের অন্তর্বর্তীকালের জন্য এখানে বিশ্রাম লাভের অভিপ্রায়ে আসে। চৈত্যলোক যদি দেহ, প্রাণ ও মনের পর্যায়ের একটিমাত্র তত্ব হতো, তাদের সমকক্ষ হতো, অন্যান্য লোকসমূহের মত একই প্রকারের একটি বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত হতো, তবে তাহা অপর সকল লোকের আত্মা হতে পারতো না, অপর সকলের ক্রমবিকাশ সম্ভবপর করা এবং তাদের মাধ্যমে বিশ্বগত অভিজ্ঞতা সহায়ে দিব্য স্বরূপের অভিমুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির উপযোগী দিব্য উপাদান হতে পারতো না। সেই প্রকার অতি পার্থিব অনুভূতি লাভের জন্য ক্রমবিকাশমান মানবাত্মা যে সব লোকে গমন করে চৈত্যলোক তাদের অন্যতম হতে পারে না, ইহা এমন এক লোক সেখানে চৈত্যপুরুষ বিশ্রামার্থ আপনাতে আপনি উপসংহৃত হয়, তার উদ্দেশ্য, নিজ অনুভূতি সমূহ আত্মগত করা এবং স্বকীয় মৌলিক চেতনা ও চৈত্যপ্রকৃতিতে পুনরায় অবগাহন করা।

অল্পসংখ্যক যারা নির্বাণ বা মোক্ষে প্রবেশ করে তাদের পক্ষে সৃষ্টির উর্ধ্বতর লোকসমূহে সোজাসুজি গমনের প্রশ্ন উঠে না।

চৈত্যলোকে অপসৃত মানবাত্মাদিগের অবস্থা একেবারেই নিশ্চল (static। প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে উপসংহৃত হয় এবং অপর সকলের সহিত কোন যোগাযোগ থাকে না। যখন তারা ধ্যান হতে বুত্থিত হয়, তখন তারা নবজীবনের জন্য অবতরণ করতে প্রস্তুত।

আরও এক প্রকার জীব আছে, চৈত্যলোকের তারা অভিভাবক, তাদের পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক নাই। তাদের সম্পর্ক শুধু চৈত্যলোকের সহিত এবং যে সব মানবাত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তাদের প্রত্যাবর্তনের সহিত তাদের সম্পর্ক।

চৈত্যলোকের অধিবাসী জীব মর্তলোকবাসী মানবাত্মার সহিত মিশে এক হয়ে যেতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে যা ঘটে তা এই যে, অতি উন্নত কোন চৈত্যপুরুষ কখন কখন তার একটি বিভূতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে, সেই বিভূতি মানব দেহে বাস করে দেহটিকে চৈত্যপুরুষের উপযোগী করার জন্য প্রস্তুত করতে থাকে এবং প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে চৈত্যপুরুষ নিজে জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে। এরূপ হয় যখন কোন বিশিষ্ট কৃত্যের জন্য মানব আধার

প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় তখন। এরূপ অবতরণের কালে আধারের ব্যক্তিত্বে এবং প্রকৃতিতে অকস্মাৎ আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে।

সচরাচর মানবাত্মা অবিচ্ছিন্ন ধারায় একই প্রকারের লিঙ্গপ্রাপ্ত হয়। যদি লিঙ্গ পরিবর্তিত হয় তবে তাহা ব্যক্তিত্বের জড়াংশ সম্ভূত, মুখ্যকেন্দ্রগত অংশ নহে।

পুনর্জন্মের জন্য আগমনশীল মানবাত্মা ঠিক কোন সময়ে দেহে প্রবেশ করে সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম নির্দেশ করা যায় না। কোন কোন মানবাত্মা গর্ভধারণের সময় থেকেই জন্মের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মাতাপিতার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করে এবং ভ্রূণের ভবিষ্যত ব্যক্তিত্ব সংগঠন কার্য নিয়মিত করে, অপরে কেবল মাতৃগর্ভ থেকে নির্গমনের কালে এসে যোগদান করে; কেহ কেহ আরও পরে জীবনের কোন অবস্থায় এসে দেহে প্রবেশ করে। এসব ক্ষেত্রে চৈত্যপুরুষের কোন বিভূতি এসে পূর্ব থেকে জীবনধারণ করে।

একথা লক্ষ্য করা উচিত যে ভবিষ্যৎ জন্মের শর্তসমূহ মূলতঃ নির্ধারিত হয় মৃত্যুকালে, চৈত্যলোকে অবস্থানের সময় নহে। মৃত্যুকালেই চৈত্যপুরুষ পরবর্তী পার্থিব জীবনে কী কী অনুষ্ঠান করবে তা নিরূপণ করে এবং তদনুসারে সব শর্তগুলি আপনা হতেই সংঘটিত হয়।

পুনর্জন্ম এবং নবজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের শাস্তি এরূপ প্রচলিত ধারণা অমার্জিত মানব মনের "ন্যায়ত্ব বুদ্ধি" প্রসূত, কিন্তু ইহার কোন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই এবং ইহাতে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বিকৃত করা হয়। ঐহিক জীবন এক ক্রমবিকাশ এবং মানবাত্মা অভিজ্ঞতা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় – যদি দুঃখ আসে তবে তাহা উক্ত প্রয়োজন সাধনের জন্যই আসে। অজ্ঞতার অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী ভ্রান্তি সমূহের জন্যে, ভগবান বা বিশ্ববিধানের প্রদত্ত শাস্তিস্বরূপ নহে।

জীবন্মুক্ত তাঁর পূর্ব নির্ধারিত যে কোন অভীষ্ট স্থানে গমন করতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করলে নির্বাণে প্রবেশ করতে পারেন কিংবা কোন দিব্য লোকে গিয়ে বাস করতে পারেন, অথবা যে কোন লোক হতে পৃথিবীতে ঘটমান প্রগতির সহিত সংস্পর্শ রক্ষা করতে ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটির প্রভেদ নির্ণয় করেছিলেন। ক্রমবিকাশমান জীবাত্মা ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণপূর্বক হয় নির্বাণের মাধ্যমে ধনাত্মক অপসারণের দিকে অথবা সচ্চিদানন্দের ক্রমবর্ধনের বিকাশের অন্তর্গত কোন ধনাত্মক দিব্য সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়।

(কালাপানি থেকে জাহাজ) ফিরে আসার অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন জটিল। দিব্যপুরুষ সর্বদাই ফিরে আসতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন ঈশ্বরকোটি জন্ম ও অমরত্বের মধ্যবর্তী সিঁড়ির ধাপসমূহ ইচ্ছামত উঠতে বা নামতে পারে।

দিব্যপুরুষের প্রত্যাগমনের জন্য নবজন্মের পূর্বে চৈত্যলোকে প্রত্যাবর্তনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

অগ্রগত মানবাত্মা যিনি জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন, তিনি পরম পুরুষের মধ্যে নিমজ্জিত - নিমজ্জন অর্থ অপলাপ নহে। এরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ চৈত্যলোকে সুষুপ্ত থাকেন না। কিন্তু এক আনন্দময় নিমজ্জনের অবস্থায় থাকতে পারেন অথবা কোন মহৎ উদ্দেশ্য প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

চৈত্যপুরুষ একাধিক শরীর গ্রহণ করতে পারে না। অধিমানস লোকের দেবগণ (God of overmind) বিভিন্ন মানব দেহে বিভিন্ন বিভূতি (emanation) প্রেরণ করে একই সময়ে একাধিক শরীর ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। দেবগণের অংশ বিশেষ (পুষ্পের সৌরভের ন্যায়) যখন অন্যত্র সংক্রমণ করে তখন তাকে বলা হয় বিভূতি (দেব বিভূতি)

চৈত্যলোকের অভিভাবকগণ মানবাত্মা নহেন, তাঁরা সেখানে কোন পদ বিশেষে কাহারও দ্বারা নিয়োজিতও হন নাই অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েও কোন কর্তব্য স্বীকার করেন নাই - তাঁরা চৈত্যলোকেরই জীব, সেখানে নিজ নিজ সহজাত কর্ম সম্পাদন করে চলেছেন।

বিপথে গমন, অসম্পূর্ণ কর্মসম্পাদন -অনেক কিছু ঘটতে পারে। মৃত্যুকালীন চৈত্যপুরুষের নির্বাচনেই পরবর্তী নব নব কোষ পরিগ্রহের কার্য সম্পন্ন হয় না, কেবল নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। যখন সে চৈত্যলোকে প্রবেশ করে তখন সে তার অভিজ্ঞতার সারাংশ আত্মগত করতে আরম্ভ করে (assimilation)। এই আত্মস্থকরণের ফলেই পূর্বনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যৎ চৈত্য পুরুষের গঠন সুসম্পন্ন হয়। যখন আত্মস্থ করা শেষ হয়, তখন সে নবজন্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যারা অত উন্নত স্তরের নয়, তারা নিজেরা সব

কিছু সম্পন্ন করে না, উর্ধ্বলোকের জীব ও শক্তিসমূহের উপর সে সব কাজ ন্যস্ত। আবার যখন সে জন্মগ্রহণ করার জন্য আগমন করে তখন তার নিজস্ব করণ সমূহ অভীষ্ট কর্মের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন না হতে পারে, কারণ এখানে তার নিজের শক্তিরাজি এবং বিশ্বের শক্তিরাজির মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত হতে পারে। ব্যর্থতা, বিপথে গমন, অসম্পূর্ণ কর্মসম্পাদন – অনেক কিছু ঘটতে পারে।

পরিপুষ্ট চৈত্যপুরুষ এই একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনের ব্যাপারে অনেক সচেতন এবং অধিকাংশ করনীয় কাজ নিজেই সম্পন্ন করে। চৈত্যপুরুষের পরিপূর্ণতার তারতম্যে সময়েরও তারতম্য ঘটে। একবার যখন চৈত্যপুরুষ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন সে তার নিজের সময় এবং গতির তাল নির্ধারণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা দ্বারা উন্নতি লাভ। অতএব অতীত কর্মের প্রতিক্রিয়ারূপে যা কিছু আসে তা জীবের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্যই আসে। ক্লাসের ভাল ছেলেদের জন্য (অতীতের) মিষ্টান্ন, আর মন্দ ছেলেদের জন্য বেত্রাঘাতরূপে আসে না।

ভাল ও মন্দের প্রকৃত দায়িত্ব এই যে ভাল আমাদের ক্লেশ স্পর্শের ঊর্দ্ধে উচ্চতর প্রকৃতিতে নিয়ে যায় আর মন্দ আমাদের ক্লেশের গন্ডীর মধ্যে অবস্থিত নিম্ন প্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে।

চৈত্যপুরুষ একবার মানব চেতনা লাভ করে পুনরায় হীনতর চেতনায় ফিরে যেতে পারে না। প্রাণময় প্রকৃতির বা শক্তির কিয়দংশ পারে এবং প্রায়ই করে থাকে, যদি পার্থিব জীবনের কোন কিছুর উপর প্রবল আসক্তি থাকে তবেই।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চৈত্যপুরুষ মনোময় ও অন্যান্য কোষগুলি (পার্থিব দেহ ব্যতীত) পরিত্যাগ করে না। পৃথিবীর সহিত আদান প্রদান করার সীমা অতিক্রম করে একেবারে নাগালের বাহিরে যেতে সাকুল্যে তিন বৎসর লাগে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে শীঘ্রতর অথবা অধিকতর বিলম্বিত প্রয়াণ সম্ভবপর। চৈত্যলোক পৃথিবীর সহিত আদান-প্রদানের সম্পর্ক রাখে না।

ভূত বা বিদেহী আত্মা আবির্ভাবের জন্য যে বৈঠক হয় তাতে কখনও চৈত্যপুরুষ আসে না। ওসব বৈঠকে যা আসে তা হোল এক প্রকার মিশ্রণ

DO NOT COPY

মিডিয়মের অবচেতনের (সাধারণ অর্থে, চৈত্য অর্থে নয়) সহিত অন্যান্য যারা সে বৈঠকে বসে তাদের অবচেতন, কোন বিদেহী আত্মার পরিত্যক্ত কোষ বা কোন প্রাণময় দেহে, অথবা হয়ত উক্ত বৈঠকের জন্যই বানানো কিছু একটা (আদান-প্রদান করে প্রাণময় অংশ) প্রাকৃত শক্তিধর, পৃথিবীর সমীপবর্তী নিম্নতম স্থূলতত্ব মিশ্র প্রাণময় লোকের আত্মারা ইত্যাদি ইত্যাদি মিশে যায়।

কখন কখন এমন সব বিষয় আসে যা উপস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ জানে না বা স্মরণ করতে পারে না। কখন কখন ভবিষ্যতের আভাস ও পাওয়া যায়।

দুঃখের নিবৃত্তি হতে পারে তখনই যখন কেহ দিব্য ভাগবত সত্তার মধ্যে বাস করে, নিজের ভেদময় ক্ষুদ্রতর আমিত্বের মধ্যে আর মোটেই থাকে না।

তখন আর শোক করতে হয় না, কারণ, তখন সত্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ হয়েছে এবং সত্যই স্থিরত্ব ও শান্তি আনয়ন করে।

একটি জিনিষ যা যথার্থই মূল্যবান তা হলো দিব্যপুরুষ ভগবানের অভিমুখী হওয়া। কেহই মৃত নহে, কেবল পরলোকগত। **

** (শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে সঙ্কলিত; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা **শ্রী অনিলবরণ রায়**

(অষ্টম অধ্যায়ের নির্বাচিত অংশ-১)

মানুষের যে সাধারণ জীবন, রামপ্রসাদ সেটিকে ঘানি কাঠে বাঁধা বলদের জীবনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। বলদ এমনই অজ্ঞ সে যে কষ্টের জীবন যাপন করিতেছে, ইহা অপেক্ষা যে উন্নততর সূক্ষ্মময় জীবন পাইতে পারে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নাই। নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করা ত দূরের কথা, সে যাহাতে নিজের অবস্থাটা বুঝিতে না পারে সে জন্য তাহার চোখটা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে মনে করিতেছে কত পথই আগাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ একই জরা ব্যাধি মৃত্যুময় দুঃখ ও অশান্তিময়

জীবনে বারবার জন্মগ্রহণ করিতেছে, মরিয়া আবার সেই জীবনেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। মানুষের এই অজ্ঞান রহিয়াছে তাহার মনে, তার বুদ্ধিতে – কিন্তু এই মনবুদ্ধিই তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, এটা তাহার বাহিরের আবরণ বা পোষাকের মত – ইহার পিছনে যে আত্মা আছে সেইটিই তাহার প্রকৃত স্বরূপ – সেই আত্মা সচ্চিদানন্দ ভগবানেরই অংশ, তাঁহারই মত সচ্চিদানন্দ, তাঁহার চেতনায় দুঃখ বা অশান্তির লেশ নাই, তাঁহার জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, গীতার ভাষায় ন জায়তে ম্রিয়তে বা। যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিলে জীবন হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবে। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া যখন সেই শোকে অর্জ্জুন কাতর হইয়া তাঁহার ভগবদ্ নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিতে বিরত হইলেন, তাঁহার সেই শোক ও বিষাদকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার শিক্ষার আরম্ভেই মূল সত্য আত্মার বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল।

সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ বলা হইয়াছে আর এই যে দেহ মন বুদ্ধির মধ্যে মানুষ এখনও বাঁধা পড়িয়াছে এইটিকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন। পুরুষ প্রকৃতির ফাঁদে কেমন করিয়া পড়িল বলা যায় না, তাহা অদৃষ্ট। তবে এই বন্ধন হইতে মুক্তির পথটা সাংখ্য দেখাইয়া দিয়াছে। পুরুষের যখন বিবেক জাগ্রত হয়, পুরুষ জানিতে পারে যে সে এই প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তখন সে আর প্রকৃতির খেলার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে না। সে উদাসীন হয় – তখন প্রকৃতি আপনিই সরিয়া যায়, পুরুষ মুক্তি পায়। সাধারণ জীবনে দেখা যায়, পুরুষ নারীর দ্বারা মোহিত হয়। সে যতই নারীর দিকে বাসনার সহিত দৃষ্টিপাত করে, নারী ততই তাহার মোহিনী মায়া বিস্তার করে। কিন্তু পুরুষ যদি তাহার দিকে ফিরিয়া না চায়, নারীর মোহিনী শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সাংসারিক জীবন সম্বন্ধেও তাই, সে জীবনে যাহাদের বৈরাগ্য আসে, তাহারাই মুক্তি পায়। আর যাহাতে এই বৈরাগ্য আসে সেই জন্য জীবনের দুঃখময় পর্যায়টার দিকেই দেখিতে হয়। মরীচিকায় জলের আশার ন্যায়, সংসারে সুখের আশা করিতে নাই। ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার এইটিই হইয়াছে মূল ধারা।

কিন্তু বাংলা দেশে ইহার এক নূতন রূপায়ণ হইয়াছে। বাঙ্গালী প্রকৃতিকে শুধু বন্ধনকারিনী দুঃখদায়িনী একটি ভিন্ন সত্তা বলিয়া দেখে নাই, প্রকৃতিকেই জগন্মাতা, মানুষ সকলেই তাঁহার সন্তান, ভাবিয়াছে। ইহাই বাংলার অধ্যাত্ম ঐতিহ্য। মা সন্তানকে দুঃখ দেন, দরকার হইলে প্রহারও করেন। বাঙ্গালী সংসারের সকল দুঃখকে মায়ের দেওয়া বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। মা

যতই মারে, ছেলে ততই মা মা বলে মাকেই আঁকড়াইয়া ধরে – ভগবানের সহিত বাঙ্গালী এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জগতের আধ্যাত্মিক গুরু হইবার সামর্থ্য অর্জন করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে জগতে যে নুতন জাতি গড়ে উঠবে তার ছাঁচ প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশই জগতের মেরুদণ্ডস্বরূপ হবে। বাঙ্গালীকেই জগতের শান্তি ও মঙ্গল সাধনের জন্য সর্বাগ্রে প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে।" শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যতে নূতন জাতির কথা বলিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের শতবার্ষিকীতে শ্রীমা বলিয়াছেন, "শত শত বৎসর ধরিয়া মানব জাতি এই সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। আজ সেই সময় উপস্থিত। আমি শুধু ইহাই বলি না, আমরা এখানে পৃথিবীতে আসিয়াছি আরাম ও আমোদ প্রমোদ করিতে, এখন তার সময় নহে। আমরা এখানে রহিয়াছি নূতন সৃষ্টিটির জন্য পথ প্রস্তুত করিতে। এখন বীরত্বের সময় আসিয়াছে। সাধারণতঃ লোকে যাহা জানে সে বীরত্ব নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত হওয়া, যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি। আর যারা বীর হইবার আন্তরিক সঙ্কল্প করিয়াছে তারা সকল সময়েই ভগবানের সাহায্য পাইবে। এই হল কথা।"

বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে, কাজে মাতিয়া যাইতে পারে, কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস ও ধৈর্য্য নাই।। এই ত্রুটিটি দূর হইলেই বাঙ্গালী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি হইবে। বাঙ্গালী হৃদয় দিয়া জগন্মাতাকে চিনিয়াছে, তিনিই বন্ধন করিতেছেন, তিনিই খুলিয়া দিতে পারেন ও দিবেন – এটা তারা সহজেই মানিয়া লয়। কিন্তু এর ত একটা ব্যাখ্যা বুদ্ধি দাবী করে। তার উত্তর না দিলে ঐ অন্ধবিশ্বাস বেশী দূর লইয়া যাইতে পারে না। দুর্গোৎসবে কয়দিন বাঙ্গালী ধরিয়া লয় যে মা তাহাদের গৃহে আসিয়াছেন। সেই আনন্দে তাহারা কয়দিন আত্মহারা হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনের দিন তাহাদের চোখে জল আসে। কিন্তু সত্যই যদি দুর্গতিহারিনী দুর্গা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আসিতেন, তাহা হইলে কি আজ তাহাদের এত দুর্দশা ও দুর্গতি হইতে পারিত? আর মা কি কোনদিন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন যে তাঁকে ডাকিয়া আনিতে হইবে আবার বিদায় বিসর্জ্জন দিতে হইবে? এ সব প্রশ্ন লইয়া বাঙ্গালী মাথা ঘামাইতে চায়না, তাই তাহাদের সব যজ্ঞই ভস্মে ঘৃত ঢালা হইতেছে। তন্ত্রের সাহায্যে বাঙ্গালী ভগবানকে মাতারূপে পূজা করিতে শিখিয়াছে, আজ বেদান্তের সাহায্যে ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া লইতে হইবে। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রের সাধনার উপরেই জোর দিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ বেদান্তের উপর জোর

দিয়াছিলেন। আজ এই দুইয়ের পূর্ণ সমন্বয়ের দিন আসিয়াছে এবং সেইটি হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার মধ্যে।

জগন্মাতা কিভাবে বন্ধন করেন, আবার মুক্তি দেন তার একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে বেদান্তের প্রামান্য গ্রন্থ গীতায়। গীতায় ভগবান বলিতেছেন তাঁর দুই প্রকৃতি – পরা আর অপরা। মানুষের দেহ, প্রাণ, বুদ্ধি লইয়া যে প্রকৃতি তাহা অপরা, আর ভিতরে যে আত্ম-চেতনা, আত্ম-শক্তি, তাহাই পরা। দুইটিই ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি পরারই নিজের রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ রাস্তায় একটি বেশ্যাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মা, তুই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিস?" মানুষ মূলতঃ ভগবানের অংশ, আত্মা সে দেহ প্রাণ বুদ্ধির অপরা প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছে কারণ জড় দেহকে ধরিয়া তাহার মধ্যেই ভগবানের প্রকাশ করিতে হইবে। সন্ন্যাসীরা চাহেন, এই দেহের জীবনকে ছাড়িয়া ব্রহ্মে লীন হওয়া। কিন্তু এই দেহকে ধরিয়াই তার মধ্যে ভগবানের এক প্রকাশ করা যায় গীতা এভাবে ইঙ্গিত দিয়াছে। এইটিকেই শ্রীমা বলিয়াছেন নূতন সৃষ্টি। পৃথিবীতে ভগবানের প্রকাশের উপযোগী দেহ সৃষ্টি করিতে প্রকৃতিকে যুগ যুগান্তর ক্রম বিবর্তনের ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে – সৃষ্টির মধ্যে যখন যাহাদের আবির্ভাব হইল তাহাদের মধ্যেই যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূচনা হইল সেইগুলি নানা পশু পক্ষীর ভিতর দিয়া ক্রমে এই মানব দেহে আসিয়াই পূর্ণাবয়ব পাইয়াছে। তবে মানব দেহেও এখনও অনেক ত্রুটি রহিয়াছে – জগন্মাতার যে ঊর্দ্ধের রূপ পরা প্রকৃতি অধ্যাত্ম চৈতন্য, তাহাকে এই দেহ প্রাণ মনের মধ্যে আহ্বান করিয়া এই মানব জীবনকে দিব্য জীবনে পরিণত করিতে হইবে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব সেই দিব্য জীবনেরই প্রতীক।

ঢাক ঢোল বাজাইয়া ষোড়শোপচারে প্রতিমা পূজা করিলে উৎসব হইবে বটে, কিন্তু উহা দ্বারাই দিব্য জীবন লাভ করা যাইবে না। ঐসব দ্রব্যযজ্ঞের দিন এখন আর নাই, এখন চোখের ঠুলি খুলিয়া জগন্মাতার অভয়পদ দেখিতে হইবে। শ্রীমা এইটিকেই বলিয়াছেন সংযুক্ত হওয়া। ভগবানও আছেন, মানুষও আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যোগ নাই, এইটিই সংসারে সকল দুঃখ কষ্টের মূল কারণ। ভগবান সর্বত্র রহিয়াছেন, আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁর দিকে না ফিরিয়া অহংয়ের সেবা করিতেই ব্যস্ত। শ্রীমা বলিয়াছেন, "সকল সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, সীমার বন্ধন জয় করিতে হইবে, আর সবের উপর তোমার অহংকে বলিতে হইবে, তোমার দিন

গিয়াছে। সেইটিই আমরা চাই – সেই ভগবদ্ চৈতন্য যাহা এই জাতিকে গড়িয়া তুলিবে।”

যে অহং আমাদের নিকট হইতে ভগবানকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, সেইটিকে নির্মূল করিবার উপায় হইতেছে গীতার কর্মযোগ। এখন সব বাহ্য পূজা অর্চনা ছাড়িয়া দিয়া আমাদিগকে কর্মযোগের সাধনা করিতে হইবে। কর্মযোগের মূল কথা হইতেছে, অক্লান্ত ভাবে কাজ করা, যে কাজটি করিবে সেটিকে যথাসম্ভব সর্বাঙ্গসুন্দর করা, আর নিজের বা আত্মীয় স্বজনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ না করিয়া, যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, জগতের মঙ্গল হয়, সেইটিকেই ভগবানের কাজ জানিয়া সর্বান্তকরণে অনুষ্ঠান করা। এইভাবে যদি আমরা আমাদের সব কিছু, সব চিন্তা, শক্তি, ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করি, তিনি আমাদিগকে তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমাদের জন্য অবিমিশ্র আনন্দ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ দিব্যজীবন গড়িয়া দিবেন।

আনন্দময়ী মায়ের অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য**

আনন্দময়ী মা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সেওরা গ্রামে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম মোক্ষদাসুন্দরী। আনন্দময়ী মার বিয়ে হয় ভোলানাথ নামে জনৈক যুবকের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সাংসারিক জীবনের তুলনায় আধ্যাত্মিক জীবন সমুন্নত। তিনি হচ্ছেন মহামায়ার অবতার – জ্যান্ত দুর্গা। তাঁর অলৌকিক বিভূতির সীমা–পরিসীমা নেই।

বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হলো। ভক্তেরা সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে মা ও ভোলানাথকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মূর্তির মাপ কি হবে?

মা আনন্দময়ী ভোলানাথকে একটা কাঠি দিয়ে নিজের শরীরের মাপ নিতে বললেন। তাই হলো।

মায়ের শরীরের মাপেই বাসন্তী প্রতিমা তৈরী করানো হলো। পুজো করার জন্য বিক্রমপুর থেকে পুরুত ঠাকুর এলেন। চন্ডীপাঠেরও ব্যবস্থা করা হলো। এদিকে ভোগেরও যোগাড় হচ্ছে।

ভক্ত যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রইলেন ভাঁড়ার ঘরে। মথুর বসু লোকজন খাটাতে লাগলেন। কথা হচ্ছে, তিন দিনের মধ্যে একদিন মার পূর্ব নিয়মে শুধু মুগডাল, আলুসিদ্ধ ও নারকেল ভাজার ভোগ হবে। যতলোক এই তিন দিন উপস্থিত হবে তাদেরকে প্রসাদ দিতে হবে। কিন্তু একবার যা পাক হয়ে ভোগ হয়ে যাবে আর তা রান্না হতে পারবে না। এটিই মায়ের আদেশ। এই নিয়মে কে আর আন্দাজ করতে যাবে? কিছু মেয়েভক্ত মা আনন্দময়ীর কাছে এসে বলতে লাগলেন, তুমিই তোমার জিনিষের আন্দাজ করে দিয়ে যাও। একেবারের বেশী পাক হতে পারবে না অথচ যত লোক আসবে প্রসাদ দিতে হবে। তাই হলো। মা নিজে সব জিনিষের আন্দাজ করে দিলেন।

একদল মেয়েভক্ত ভোগ রান্নায় রত হলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন রাজেন্দ্র কুশারীর স্ত্রী।

ষষ্ঠীর দিন থেকে সকলে চলে গেলেন সিদ্ধেশ্বরীতে। সম্প্রতি সেখানে কতকগুলি নতুন বাড়ী উঠেছে। জঙ্গল এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে।

সেই সব বাসাতেই ভক্তদের থাকার জায়গা হলো। পুরুষ ভক্তরা কালীমায়ের মন্দিরের বারান্দায় থাকতেন।

তখন কালীমন্দিরের বারান্দা ইত্যাদিও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছিল। পরে মন্দিরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

মা আনন্দময়ী যখন সাতদিন মন্দিরের ছোট কুঠুরীতে ছিলেন তখন কুঠুরিটির বাইরের দিকে কোন দরজা ছিল না। এখন দরজা হয়ে ঘর পরিষ্কার হয়েছে।

ষষ্ঠীর অধিবাস ইত্যাদি হয়ে গেল। সপ্তমী পুজো শুরু হলো। অতি ভোরে মা শয্যা ত্যাগ করে কালীবাড়ীর পুকুরে স্নান করে এলেন ও ভাঁড়ার

ঘরের দিকে গিয়ে কি কি পরিমাণ রান্না হবে তা বলে দিয়ে এলেন। পরে প্রতিমার সামনে বেদির ওপর গহ্বরের মধ্যে বসে থাকলেন। সেখান থেকে আর উঠলেন না। সারা দিনরাত ঐভাবে কেটে গেল। একটু সামান্য দুধ একবার মাত্র পান করলেন। তাও দিনের শেষে। পুরুতঠাকুর পুজো করার আগে ভোলানাথ মা আনন্দময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বীজমন্ত্রে পুজো হবে? তাই শুনে মা আনন্দময়ী কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললেন, বীজ যেন কিছু উচ্চারণ করে না। পুজো সব ঠিক মতোই করবে। যেখানে বীজের উচ্চারণ দরকার হবে সেখানে প্রতিবারই যেন একটু চুপ করে থেকে পুজো করে যায়।

মা আনন্দময়ীর সমস্ত কাজেই রয়েছে অলৌকিকত্বের ছোঁয়াচ। তিনি যেমনটি বলে দিলেন ঠিক তেমনটি হলো।

মা পুরুতঠাকুরের খুব কাছে বসে আছেন। ঘোমটায় মুখ ঢাকা। হাতে সর্বদাই কোন রকমের মুদ্রা থাকতো। এখনও তাই আছে। পুজো হলো। তারপর হলো ভোগ। সকলে প্রসাদ পেল। রাত্তিরে মা ঐ গহ্বরের মধ্যেই কখনো বসে থাকতেন, কখনো পা লুটিয়ে শুয়ে থাকতেন। ঐ ঘরের একধারে ভোলানাথ শুলেন। জনৈক স্ত্রী ভক্ত মার গহ্বরের কাছেই শুয়ে থাকতেন। আর কেউ ঐ ঘরে থাকতেন না।

পরদিন আবার সব জিনিষের ভোগ হবে। মথুর বসু চাকরদের দিয়ে রাতের মধ্যেই সব পরিষ্কার করে ভোগের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কীর্তনও চলতে লাগলো।

পরদিন মহাষ্টমী। আজও পূজাদি হয়ে গেছে। ভোগ আনতে একটু দেরী হচ্ছে দেখে মা আনন্দময়ীর চোখে এলো জল। তিনি কেঁদে আকুল হলেন। এই হাসি কান্নার মানে ভক্তরা কিছু বুঝতেন না। মা কখনো কেঁদে আকুল হচ্ছেন আবার কখনো হাসতে হাসতে সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। কখনো বা অট্টহাসি হাসছেন।

তাড়াতাড়ি ভোগ আনা হলো। মায়ের ভোগ হয়ে গেল। সকলে প্রসাদ পেতে বসলেন। যত লোক আসছে সকলেই প্রসাদ পাচ্ছে। এভাবে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। রান্না ঘরের জিনিসও প্রায় শেষ। বড় বড় বাসন সব খালি

DO NOT COPY

করে বের করে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর চিন্তাহরণ সমাদ্দার রান্নার সব জিনিস তুলে দিচ্ছিলেন। কেবল নিজেদের কয়েক জনের মত জিনিস আছে। তাই রেখে তিনি সব বাসন বের করে দিয়েছেন।

সন্ধ্যের একটু আগে একদল স্ত্রীলোক ও পুরুষ প্রতিমা দেখতে এসেছে। কিন্তু প্রসাদ বিশেষ কিছু নেই। কারও তখন মনে নেই মায়ের কথা। মা আনন্দময়ী বলেছিলেন, একবারের বেশী পাক হতে পারবে না। ভোলানাথ ও মায়ের শিষ্য-শিষ্যারা সকলে ব্যস্ত হয়ে ভাত বসিয়ে দিতে বললেন। তখন চার হাঁড়ি ভাত বসিয়ে দেওয়া হলো। মা আনন্দময়ী গহ্বরে স্থিরভাবে প্রতিমার দিকে মুখ করে আছেন। শিষ্যা গুরুপ্রিয়া মার কাছে এসে বললেন, মা, প্রসাদ কিছু নেই। অনেক লোক এসেছে। মা নির্বিকার ও অচপল চিত্তে বললেন, যা আছে তাই দিতে বলো। আর যেন পাক করা না হয়। মার কথা শুনে গুরুপ্রিয়া দেবীর মনে পড়লো পুরোনো কথা। তিনি চিন্তাহরণ বাবুকে বললেন মায়ের কথা। তাই শুনে চিন্তাহরণ বাবু রান্নার আয়োজন করলেন না। বাইরে যেসব বাসন ছিল তাতে হাত দিয়ে কিছু পেলেন। যা ছিল সব মিলিয়ে তখনই ঐ দলকে খাওয়াতে বসে ঐসব দিয়েই খাইয়ে দেওয়া হলো। আশ্চর্যের বিষয়, তারাও খেলেন পেট ভরে। অথচ অন্যান্য ভক্তরাও ঐ প্রসাদ হতে বঞ্চিত হলেন না। ঐ চার হাঁড়ি ভাত উনুন থেকে নামিয়ে রাখা হলো। এতটুকুও খরচ হলো না। পরদিন তা বিলিয়ে দেওয়া হলো।

মা আনন্দময়ীর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেদিন কারও এক কণা প্রসাদের অভাব হলো না। আর কেনই বা হবে! মা যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

ঐ সময় মা আনন্দময়ীর আর এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখা গেল। সপ্তমী পুজোর দিন সন্ধ্যের পরেই ঝড় উঠলো। সব কিছু পড়ে যাবার উপক্রম হলো। রান্নার ছাপড়া কোথায় উড়ে পড়ে গেছে। মা ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগলেন। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেল তাঁর মুখে বিনিন্দিত মধুর হাসি। হাতে তালিও দিতে লাগলেন।

এদিকে ক্রমশঃ ঝড়ের বেগ বেড়েই চললো। ঝড় দেখে মহা ব্যস্ত হলেন ভোলানাথ। তিনি মার শক্তির কথা বিলক্ষণ জানতেন। সেই মহাশক্তির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাসও ছিল। তাই তিনি মায়ের কাছে ছুটে এসে বলতে

লাগলেন, এ আবার কি আরম্ভ হলো? প্রতিমার যেন কিছু না হয়। মা ঐ কথা শুনেও শুনলেন না। বাতাসের বেগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেতে উঠলেন। অনেকেই এসে পুজোর ঘরে দাঁড়ালেন। ঘর ভরে গেল। ভক্তরা সব নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। মায়ের নামে কীর্ত্তন হতে লাগলো। ঝড়ের বেগের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনও বেশ জোরে চলতে লাগলো।

ভোলানাথ শুধু হাত জোড় করে মায়ের দিকে তাকিয়ে 'মা, মা' বলে ডাকছেন। তিনি কীর্ত্তনের মধ্যে যোগ দিতেন না। চুপ করে বসে থাকতেন। মা'র ভাব হলেই হাত জোড় করে শুধু 'মা, মা' বলে আস্তে আস্তে ডাকতেন। আজও তাই করছেন।

এর মধ্যে মা এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে সকলেই বেরিয়ে পড়লেন। মা নানা জায়গায় ঘুরলেন। শেষকালে এলেন কালীমায়ের মন্দিরের সামনে। তার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর বেরিয়ে গেলেন। এবার গিয়ে পাশেই রাজমোহন বাবুর বাড়ীতে একটা ছোট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেই বাড়ীতে মেয়েদের থাকবার জায়গা হয়েছিল। এই পুজো উপলক্ষে ভোলানাথের বড়ভাই রেবতীবাবুর স্ত্রী, তাঁর মেয়ে লাবণ্য ও তাঁর জামাই প্রভৃতি সকলে এসেছিলেন। এই মেয়ের জন্মের সময় মা ছিলেন আঁতুর ঘরে। মেয়েটি খুবই সাদাসিধে। মা ঘরে ঢুকতেই ভোলানাথ পুজোর ঘরের দিকে চলে যান। গিয়ে দেখেন, সেই ঘরের কাছেই কাদামাটির মধ্যে লাবণ্য লুটোপুটি খাচ্ছে। তার সমস্ত শরীর কাদায় ঢেকে গেছে। কেবল তার মুখ হতে 'হরিবোল' এই শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভোলানাথ গিয়ে মেয়েটিকে মাটি থেকে ওঠালেন। তার তখন খেয়াল নেই। মুখে হাসি, প্রশান্ত মূর্তি। কেবল 'হরিবোল' শোনা যাচ্ছে। এই অবস্থা সকলে গিয়ে দেখলো। ভোলানাথ দৌড়ে গিয়ে মাকে ডেকে নিয়ে এলেন। কাদা পরিস্কার করে ধুইয়ে দিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে মেয়েটিকে মা রাজমোহন বাবুর বাড়ীতে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও গেলেন সেখানে।

মেয়েটির অপূর্ব অবস্থা। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। কেবল নামরসে ডুবে আছে তার চিত্ত। মেয়েটির এমন অবস্থা দেখে তার মা ও স্বামী মহাব্যস্ত হয়ে

পড়লেন। মেয়েটির মা আনন্দময়ী মার কাছে এসে বললেন, তাড়াতাড়ি এই ভাব কাটিয়ে দাও। এরকম হলে কি করে গৃহস্থালী চলবে? এরপর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, আর আমি তোমাকে খুড়ীমার কাছে আস্তে দিচ্ছি না। এখানে এসেই এই অবস্থা হলো।

মেয়েটির মা ভয়ানক রেগে গেছেন। মেয়েটি ঐ আবিষ্টভাবেই মায়ের দিকে তাকিয়ে বলছে, দেখুন তো খুড়ীমা, আমি পাগল হয়েছি নাকি? মা এমন করছেন কেন? কি মধুর নাম। আপনিই তো এই মধুর নাম শিখিয়েছেন। ঐ নাম ছাড়া আর কি আছে?

আনন্দময়ী মা মেয়েটিকে নিয়ে একান্তে একটি ঘরে গিয়ে বসলেন। সঙ্গে ছিলেন শিষ্যা গুরুপ্রিয়া। আনন্দময়ী মা গুরুপ্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, দেখ এখন এর যে অবস্থা এই অবস্থা অনেক সাধনায়ও মেলে না। কিন্তু কি করবো? এর মা প্রভৃতি কেউ অবস্থা বুঝছে না। আমি কি করবো? এই বলে মেয়েটির শরীরের উপর একটু কি ক্রিয়া করতে লাগলেন। মেয়েটি কিছুক্ষণ স্বাভাবিক থাকার পর আবার এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়লো।

মা আনন্দময়ী বলতে লাগলেন, দেখ, যেমন বড় আগুনে একধারে জল ঢাললে অপর ধারে জ্বলে ওঠে, এ-ও তাই হচ্ছে।

মায়ের অলৌকিক প্রভাবে ধীরে ধীরে মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠলো। তার ঐ অলৌকিক ভাব তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অনেক সময় লৌকিক প্রয়োজনের খাতিরে অলৌকিক ভাব দমিয়ে রাখতে হয়। মেয়েটি তাতে অসমর্থ হলেও মা আনন্দময়ীর অলৌকিক প্রভাবে তা সম্পন্ন হলো।

এমনি আরও অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায় মা আনন্দময়ীর বিরাট আধ্যাত্মিক জীবনের পটভূমিকায়।

মা আনন্দময়ীর এমন অলৌকিক প্রভাব যে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। প্রাণ ফিরে পেয়ে নবজীবনের পথে নবযাত্রা শুরু করে।

DO NOT COPY

সীতানাথ কুশারীর একমাত্র পুত্র মঙ্গলের বৌটির ছেলে হলে বাঁচে না। একটি সন্তান বড় হলে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে আসতেই আগেরটি মারা যায়। এভাবে দুটি সন্তান মারা গেছে। এবার বৌটি একটি মেয়ে কোলে নিয়ে এসেছে মা আনন্দময়ীর কাছে। তার বয়স মাত্র দু'বছর। বৌটির আবার গর্ভাবস্থা। মায়ের কাছে কাঁদছে। কাতর স্বরে বলছে, আমার এই অবস্থা, এবার হয়ত এই মেয়েটিও মারা যাবে। অবশেষে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে বৌটি তার ঐ মেয়েটিকে মা'র পায়ে নিবেদন করে দিল। সেই থেকে মেয়েটি মায়ের কাছে রইলো। মেয়েটির নাম মরণী।

মা আনন্দময়ী মেয়েটিকে সর্বদা কাছে নিয়ে ঘুরতেন। তাকে কখনো বাপের বাড়ী যেতে দেননি। পরে মরণীর মার একটি সন্তান জন্মাল। সে মারা গেল। কিন্তু মরণীর কিছু হলো না। পরে মরণীর মার আরও দুটো সন্তান হলো। তারা বেঁচে গেল। আর সেই সঙ্গে বেঁচে গেল মরণীও।

মা আনন্দময়ীর অলৌকিক প্রভাবে স্বয়ং যমরাজও ভয়ে অস্থির হয়ে পালিয়ে গেল। মরণীর গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারলে না।

আজকের বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

প্রশ্ন- দেখুন, সাহিত্য নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ধর্ম টর্ম নিয়ে মাথা ঘামানো কি ঠিক?

উত্তর-আপনি বুঝি প্রবন্ধের শিরোনামটি লক্ষ্য করেছেন?

প্রশ্ন-আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি প্রশ্নেই জবাব দিলেন, কিন্তু মূল বক্তব্যের ধার দিয়ে গেলেন না।

উত্তর- বক্তব্য কিছু থাকলে অবশ্যই যাবো। আগে দেখতে হবে আপনার প্রশ্নে কোন বক্তব্যের সন্ধান মেলে কি না। আপনি বলছেন, যা ধর্ম তা সাহিত্য নয়। নিশ্চয় সাহিত্যই যে কারো ধর্ম হতে পারে, একথায় আপনার আপত্তি নেই। কিন্তু ধর্ম সাহিত্য হয়েছে কি না সেই বিষয়ে আপনার সন্দেহ। এখানে সাহিত্যের ধারণা আপনার কি, তাই আগে স্পষ্ট হোক।

প্রশ্ন–সাহিত্যের অর্থ কি জীবন নয়?
উত্তর–জীবনের অর্থ?
প্রশ্ন–যা আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি, জানতে পারি তাই জীবন।
উত্তর–অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছাড়া যা ধরা পড়ে না, তাকে কি খালিচোখে দেখতে পান? দশবছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কি বুঝতে পারতেন? জ্ঞান বিজ্ঞানের যত শাখা প্রশাখা আছে তার সবই জানতে ও বুঝতে পারেন?
প্রশ্ন–কোন রকম অলৌকিকতা বা অনুমানের আশ্রয় না নিয়ে যে জীবনবোধের সৌন্দর্য লেখকের রচনায় ফুটে ওঠে তাই সাহিত্য নয় কি?
উত্তর–অলৌকিক বা অনুমান বলতে আপনার কাছে যা বোঝায়, আর একজনের কাছে কি তা বোঝায়? জুল ভার্ণের উপন্যাসের অনুমানগুলি আজ কতো বাস্তব, তা তো দেখাই যাচ্ছে। আর সাধারণ ইন্দ্রিয়ধারণার অতীত হলেই যদি অলৌকিক হয়, তাহলে তো বিশ্বের তাবৎ মহাপুরুষের কথাই খারিজ! সেক্ষেত্রে উপনিষদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' থেকে রামকৃষ্ণদেবের 'মানুষ তাঁর বিশেষ প্রকাশ' এই সবের কোনো অর্থই নেই। যদি সে সব চিন্তা অলীকই হয়ে থাকে, তাহলে আপনার আমার কিছু এসে যায় না, একদিন আপনিই ওসব ভ্রান্তি মানুষের ঘুচে যাবে। আর যদি বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলের কথায় বিশ্বাস থাকে তাহলে দেখবেন মানুষের সূক্ষতম অনুভূতির অপূর্ব বাঙময় প্রকাশ পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্রেই কম বেশী আছে। আবার যুগে যুগে এই সব ধর্মসাধনার প্রেরণায় কত কবি, কত লেখক শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির উদাহরণ রেখে গেছেন। তার কারণ একটি বিশেষ স্তরে এসে ধর্ম যখন অনুভূতির বিষয় হয়, তখন তা আর সব অনুভূতির মতোই সাহিত্যের প্রেরণা – অনেক সময় শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। অর্থ ও কাম যদি জীবন হয়, তাহলে ধর্ম ও মোক্ষও সেই জীবনবোধেরই আর এক প্রকাশ। সাহিত্যই যদি হয়ে থাকে, তাতে জীবনের সব চেতনার প্রকাশ থাকবে।
প্রশ্ন–আচ্ছা, বিবেকানন্দের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কি?
উত্তর–আপনি স্বামিজীর রচনাবলী সম্বন্ধে কী খবর রাখেন, জানতে ইচ্ছা করে।
প্রশ্ন–কিছু খবর না রেখেই কি বলছি? স্বামিজীর চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, দেববাণী, ভারতে বিবেকানন্দ এসব তো পড়েছি।
উত্তর–এগুলি অবশ্য সবই ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ। মূল বাংলা রচনা কি পড়েছেন?

প্রশ্ন–বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ পড়েছি। আর 'সুয়েজ খালে' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী যেন পড়েছিলাম। তাছাড়া 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' ইত্যাদি যে স্বামিজীরই রচনা তা আর কে না জানে?

উত্তর–সামান্য কিছু কিছু আপনি পড়েছেন বটে। কিন্তু তাঁর সব বাংলা রচনা আপনি পড়েন নি। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা, সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কী বলে গেছেন – এসব কখনো খুঁটিয়ে দেখেছেন?

প্রশ্ন–স্বামিজী যা লিখেছেন সবই তো ধর্ম, তার মধ্যে সাহিত্য কোথায়?

উত্তর–বাংলায় তিনি যে কটি বই বা প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে ধর্ম আনুষঙ্গিক বিষয় বটে, কিন্তু ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বদেশচেতনা, ভ্রমণকাহিনী, রসরচনা– এই জাতীয় অনেক ধরণের বিষয় নিয়েই তিনি লিখেছেন। আপনি তাঁর সে জাতীয় রচনাগুলিতে মন দেবার সময় পান নি। কিন্তু স্বামিজী লিখেছেন বলেই তা ধর্ম বিষয়ক হবে, এমন কথা তাঁর বই না পড়েই বলা বোধ ঠিক নয়।

প্রশ্ন–কিন্তু স্বামিজী কি তাঁর বেশির ভাগ লেখায় ও বক্তৃতায় ধর্মের উপরেই জোর দেন নি?

উত্তর– তা দিয়েছেন, কিন্তু যা লিখেছেন তাই যে ধর্মসংক্রান্ত বিষয় তা নয়। ধর্মের এক বিশেষ ধারণা তাঁর জীবনদর্শন। সে জীবন দর্শন তাঁর লেখায় ফুটবে বৈকি! তাঁর মৌলিক বাংলা রচনাগুলিতে নানা বিষয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত ধর্মের কথাও এসেছে। কিন্তু যেমন ধরুন তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'পরিব্রাজক'। এই বইয়ের মূলে রয়েছে দেশ বিদেশে ভ্রমণের সরল আনন্দময় উপলব্ধি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের নানা উপকরণ। বাংলা সাহিত্য এমন খোশমেজাজী ভ্রমণ কাহিনী আর আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিগূঢ় এমন বহু কথা এ ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যেই সহজ ভাবে ফুটে উঠেছে যে স্বামিজীর মনীষা ও ভুয়োদর্শনে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। আপনি যে 'সুয়েজ খালে' রচনাটির কথা বলছিলেন সেটি ঐ বইয়েরই অংশমাত্র।

প্রশ্ন–'পরিব্রাজক' নামে যে এত ভালো একটি বই আছে, তা অবশ্য জানা ছিল না। কিন্তু ধরুন স্বামীজীর 'ভাববার কথা' নামে একটি বইয়ের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে। এ জাতীয় ভক্তিবাদী মনোভাব নিয়ে কি সাহিত্যিক হওয়া চলে?

উত্তর-'ভাববার কথা' 'উদ্বোধনে', অন্য পত্রিকায় অথবা পুস্তিকার আকারে লেখা প্রবন্ধের সংকলন। আপনি যে 'বাংলাভাষা' প্রবন্ধটির কথা বলছিলেন, ওটি উদ্বোধনের সম্পাদককে লেখা স্বামীজীর চিঠি। 'ভাববার কথায়' রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। সে দুটি প্রবন্ধে ভারত ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের তাৎপর্য এবং ম্যাক্সমুলারের রামকৃষ্ণজীবনীর আলোচনা রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র অনুধ্যানে বিবেকানন্দের চেয়ে যোগ্যতর আর কার কথাই বা ভাবা চলে? কিন্তু এও কি আশ্চর্য নয় যে, তাঁর বাংলা ও ইংরাজী রচনায় গুরুবন্দনা সবচেয়ে কম? আর উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধকব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এতো সান্নিধ্যে থেকেও যদি স্বামীজী কিছুই তাঁর সম্বন্ধে না লিখতেন, তাই কি অস্বাভাবিক হতো না? বাস্তবিক ধর্ম বলতে তিনি যা বুঝতেন শ্রীরামকৃষ্ণ তো তারই বাণীমূর্তি? শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসংগ্রহই শ্রেষ্ঠ সহায়ক। সে যাই হোক এমন একজন সাধক শ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে স্বামীজীর উপলব্ধি ও লিখিত মন্তব্যের মূল আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষভাবেই চিন্তণীয়।

কিন্তু এর চাইতে বড়ো কথা - বাংলাসাহিত্যে ভাষাবাহনরূপে চলতি ভাষাকে বিশেষভাবে নির্বাচন তো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাসৌন্দর্য থেকেই বিবেকানন্দ-মানসে সঞ্চারিত। বাংলা চলতি গদ্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের রচনা নৈপুণ্যের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রেরণা। যেমন বুদ্ধকথা অবলম্বনে পালিসাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথা অবলম্বনে চলিত বাংলার নৈপুণ্য সবচেয়ে সার্থকভাবে দেখা দিয়েছিল বিবেকানন্দের রচনায়।

প্রশ্ন-কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো সাহিত্যিক নন, তিনি তো খালি বলে গেছেন।

উত্তর - সেই বলায় যদি সাহিত্যগুণ থাকে? বাইবেল বলুন, সক্রেটিসের সংলাপ বলুন, জনগণের কথোপকথন বলুন -এ সব কি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নি? গ্যয়টের আলাপচারী বা রবীন্দ্রনাথের যেটুকু ভগ্নাংশ আমরা মৈত্রেয়ী দেবী বা রাণীচন্দ্র প্রমুখের কল্যাণে পেয়েছি? রামকৃষ্ণদেবের কথা সৌন্দর্যও সেই অর্থে সাহিত্য। তার চেয়ে বেশি কিছু তো বটেই।

প্রশ্ন-ব্যক্তিগত ভিত্তিতে রচিত লেখাকে কি সাহিত্য বলবো?

উত্তর - যদি তা সাহিত্য হয়ে থাকে তবে আর ব্যক্তিগত নেই। খুব সম্প্রতি পরলোকগত হয়েছেন পন্ডিচেরীতে কবি নিশিকান্ত। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তিরসের কবি। তাঁর ভক্তি ব্যক্তিগত তো বটেই, কিন্তু তা সাহিত্য বলেই আজ সবার সম্পদ। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে একথা আরও বৃহৎ পটভূমিকায়

স্থাপন করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ শধু তাঁর বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের আরাধিত নয়, সারা বিশ্বের সাধক ও মনীষীদের মননের বিষয়।

প্রশ্ন– কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আজকের মানুষের আর সে আগ্রহ নেই। মানুষ চায় বাস্তব জীবনসমস্যার সমাধান। তাই রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ চিন্তাধারা নিয়ে মাথা ঘামাবার তার প্রয়োজন নেই, আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যোগই বা কোথায়?

উত্তর – এ কথার জবাব দেওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সংগ্রহ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পাঁচ খন্ড আপনি পড়েছেন কিনা – অন্ততঃ ওই বইগুলির সঙ্গে আপনার একটি মোটামুটি পরিচয় আছে কিনা সে কথাটি জানা দরকার। দুজনের রচনা ও কথার সঙ্গেই আপনার সামান্য পরিচয়। তবু ঐ সামান্য পরিচয়ই আপনার মনে কী ধরণের সাড়া জাগিয়েছে, সেটি অন্ততঃ বুঝিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন– বিবেকানন্দের লেখা বা বক্তৃতায় সবার আগে মনে লাগে তাঁর তেজ ও পৌরুষ। আর রামকৃষ্ণদেবের সরল কথায় শ্রেষ্ঠ তত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু সেজন্যই কি তাদের সাহিত্য বলতে হবে?

উত্তর – এ কথার উত্তর দ্বিতীয়বার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অনুভব, প্রকাশভঙ্গী, শব্দসুষমা, চিত্রসৌন্দর্য, প্রেরণাশক্তি– এসব কিছুর মিলনে যদি সাহিত্য না হয় তো সাহিত্য আর কাকে বলে আপনিই বুঝিয়ে বলুন। এঁদের দুজনের লেখায় ও বলায় যে সাহিত্যগুণ রয়েছে, তা বিশদভাবে না পড়েও যদি কিছু বোঝা যায়, তাহলে ভালোভাবে পরিচিত হলে সে সম্বন্ধে কত স্পষ্ট ধারনাই হবে।

প্রশ্ন– আচ্ছা, না হয় সাহিত্যই হলো। কিন্তু এখানে ওসব সাহিত্যের দরকার কি?

উত্তর– দরকার জিনিসটা কার এবং কোন যুগের তার উপরে নির্ভরশীল। আমার তো মনে হয় বিবেকানন্দ সাহিত্যের চর্চা এযুগেই সবচেয়ে বেশী দরকার। আপনার আমার জন্যই দরকার।

প্রশ্ন– কেন?

উত্তর– দেখুন, সবার আগে মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রতি ভালোবাসাই সব সাহিত্যের প্রাণ। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে ও রচনায় সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও মানুষের মহিমায় তাঁর বিশ্বাস। সন্দেহ নেই, তাঁর অদ্বৈত দৃষ্টিই সর্বজীবে নারায়ণজ্ঞান এনে দিয়েছে। তবু সে দৃষ্টি

দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, এমন কি চোর, অসাধু, চরিত্রহীন- সবার প্রতি এক গভীর মমতায় (তাঁর রচনা ও বাণী) পরিপূর্ণ। জীবনকে এমন সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখাই বাস্তবতা।

সুখ ও সৌন্দর্য যেমন জীবনের অনিষ্ট, দুঃখ ও বিকৃতি তেমনি জীবনের অঙ্গ। বিবেকানন্দের বিপুল বেদনা বোধ তাঁকে দুঃখ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে শিখিয়েছে। আজকের দিনে যে বাস্তব দুঃখদৈন্য বিকৃতির কথায় সাহিত্য পরিপূর্ণ, বিবেকানন্দ সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার যন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু কোনো শূন্যতাবোধের শিকার হননি। প্রতিদানহীন সেবা ও কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে দুঃখমৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই তাঁর জীবনাদর্শ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল জীবন সমস্যা তিনি প্রণিধান করেছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিচারে এ দুই সভ্যতার মানদণ্ড। ভারতবর্ষের দিনক্ষণগত ইতিহাস নয়, সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিবর্তনের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন 'বর্তমান ভারতে'। ভারতের জড়তা, আলস্য, নিশ্চেষ্ট বিকৃত মনোভাবকে তীব্রতম আঘাত করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে আহ্বান করেছেন বার বার। সেই সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক মনীষার পরম সার্থকতার কথা শুনিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। কিন্তু যে যেখানেই থাকুক 'আগে মানুষ হও'-'Manliness'- এই উদ্বোধনীমন্ত্রে জাগ্রত করতে চেয়েছেন মানুষের অন্তর্নিহিত সিংহসত্তাকে।

আজকের বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষের কি স্বামীজীকেই সবচেয়ে বেশী দরকার নয়? যা বাস্তব, যা বেদনা, যা মৃত্যু তার মুখোমুখি হয়েই সত্যকে পেতে হবে, এই যদি আধুনিক সাহিত্যের বক্তব্য হয়, তবে বিবেকানন্দের সাহিত্যই তার সূচনা।

অথচ উপদেশ, অনুশাসন, পান্ডিত্য বিস্তার -এ সব কোনো কিছুই নয় -পাঠকের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে কখনো একেবারে ঘরোয়া কথায়, কখনো সংহত বাণীভঙ্গীর মন্ত্রমহিমায় বাংলাভাষাকে তিনি ধ্রুপদী ও আধুনিক দুই চালেই আশ্চর্যভাবে খেলিয়ে গেলেন। একদিকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অন্যদিকে 'বর্তমান ভারত', আবার 'ভাববার কথা'র সেই অনবদ্য টুকরো টুকরো রসরঙ্গ। সবার উপরে তাঁর 'পত্রাবলী', জীবনের কোন অতল গভীরে তিনি ডুব দিয়েছিলেন, কী মন্ত্রবলে দেশবাসীকে জাগিয়েছিলেন, আবার বিশ্বজনের কল্যাণে কেমন করে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন- সে সব কথাই তাঁর 'পত্রাবলী'র অন্তরতম লেখনভঙ্গিমায় প্রকাশিত।

আজকের কজন লেখক জীবনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে পরিচিত? ইন্দ্রিয়গত আলোড়নের বাইরে বুদ্ধি বোধ অনুভবের যে বিরাট জগৎ রয়েছে কজনে তার খবর রাখেন? কজনের রচনায় মানুষ হারানো আত্মসম্বিৎ ফিরে পায়, জীবনে পথের সন্ধান পায়? আমরা যা ভাবি, সাহিত্যের কাজ সাহিত্যের সংবাদ তার চেয়ে ঢের বড়ো।

রামকৃষ্ণদেবের কাছেই বিবেকানন্দ সেই কুয়োর ব্যাঙের গল্প শুনে ছিলেন, যার কাছে তার কুয়োটির চেয়ে বড়ো জলাশয় জগতে অসম্ভব। সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে সেই কুয়োর ব্যাঙের ধারণাটি পালটানো দরকার। সবার আগে দরকার কোনো রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে সে রচনাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা।

❀ ❀

কবিতা ঘরে **শ্রী দীপঙ্কর নন্দী**

সময় ছেড়ে চলে গেলে। ম্যাজিক লন্ঠন মনে পড়ে –
আর কিছুদিন ইচ্ছে ছিল কাটিয়ে দেব কবিতাঘরে,
কলম হাতে হাঁটতে শেখা, শব্দ-ধূলো বইয়ের পাতা –
মেদ ঝরানো দু'চার লাইন সাগর মাপের গভীরতা,

আমরা যারা লিখছি সবে পদ্য কিংবা গল্প নিয়ে
সব রকমের কাটাছেঁড়া আড্ডাছলে খুব জমিয়ে –

সেসব কেমন নিত্য নতুন ভাঙ্গাগড়ার কাব্যশরীর
ছায়ার মত আগলে রাখা যত্নে গড়া শব্দপ্রাচীর
এক নিমেষে উধাও হঠাৎ। খবর আসে দমকা হাওয়া
ছবির ফ্রেমে আটকে এখন, জীবন মানে আসা-যাওয়া,

শব্দছবি ভাসছে শুধুই আকাশজুড়ে মেঘের মত
শোক সয়ে যায়। কাব্য দিয়ে ঢাকবে এত গভীর ক্ষত।

DO NOT COPY

এখন গান্ধারদেশ **শ্রী প্রকাশ অধিকারী**

সংবেদনহীন বিশ্ব তাকিয়ে আছে .....
কখন মানবাধিকার ধ্বস্ত হবে
পতন হবে মানব-ধর্মের
দখল নেবে চূড়ান্ত সন্ত্রাসবাদ .....

ভূলুণ্ঠিত হবে
সভ্যতার সব নিদর্শন .....
লুণ্ঠিত হবে নারীর সম্ভ্রম
বেঁচে থাকার ন্যূনতম সাধ .....

আশ্বাসহীন বিশ্বসমাজ .....
তাকিয়ে আছে
শুধু তাকিয়েই আছে।

অহংকার **স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ**

মৃত্যু কহিল, জন্ম, তোমার জগতে আসা বিফল,
আমার কবলে পড়িলে তোমার হয় অন্তিমকাল।
জন্ম কহিল, আমরা আসি, তাই এত অহংকার,
না আসিলে তুমি থাকিতে অনন্তকাল বেকার।।

DO NOT COPY

শারদ - আহ্বান **সুনন্দন ঘোষ**

তমোজাল নাশ করে নেমে আসে অনির্বাণ জ্যোতি –
তীক্ষ্ণ শূল যেন বিদ্ধ করে অরাতি শরীর।
মদোদ্ধত অসুরের স্খলিত কৃপাণে
বিস্ফারিত আতঙ্কের ছায়া।

হৃতগর্ব মানুষের যা ছিল সংগুপ্ত ক্রন্দন –
– সহসা উন্মত্ত উল্লাস –
কূলপ্লাবী জলধির মত।
যে ক্রোধ সভয়ে ছিল ভূমিস্পৃষ্ট,
যে বেদনা অবিন্যস্ত বিশ্বব্যথারূপে –
হ্লাদিত দীপ্তির স্পর্শে খুলে গেলো নিমীলিত আঁখি।

দৈত্যদর্পনিষূদিনী!
জননী, ভগিনী, জায়া – নব নব রূপে
উদ্ভাসিতা হও তুমি,
বিশ্বগতা আদিশক্তি
বিশ্বব্যথা বিমোচন করে।

DO NOT COPY